# সবুজ শিল্প

## লেঃ কমান্ডার মহসিন আলী

বাংলাদেশের সামগ্রিক চিত্রপটে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের অবদান প্রধান প্রধান শিল্পখাত সমূহের ন্যায় উল্লেখযোগ্য না হলেও এটি দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পখাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আবার অন্যদিকে দেশের সবচেয়ে বিপদজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হিসেবে জাহাজ ভাঙা শিল্পকে বিবেচনা করা হয়। বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে মাঝারি ও ছোটো স্টিল ও রি- রোলিং কারখানা এবং ঢালাই কারখানার প্রধান কাঁচামাল হিসেবে লোহা/স্ক্র্যাপ পণ্য স্থানীয়ভাবে যোগান দেওয়ার প্রধান উৎস হলো জাহাজ ভাঙা শিল্প। ইস্পাতের মতো কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে জাহাজ ভাঙা শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

উনিশ শতকের আগেও সমুদ্রের জাহাজগুলো ছিল মজবুত কাঠের তৈরি। সেসব জাহাজ অচল হয়ে গেলে পুড়িয়ে ফেলা হতো কিংবা সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হতো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অচল জাহাজের পুরাতন কাঠ বাছাই করে পুনরায় ব্যবহারেরও নজির ছিল। প্রযুক্তির বিবর্তনের ফলে এক সময় কাঠের জাহাজের জায়গায় সমুদ্রে ভাসানো হলো ইস্পাতের তৈরি জাহাজ। এ সব জাহাজ অনেক মজবুত, অনেক বছর অনায়াসেই ব্যবহার করা যায়। সাগরে ঝড়- তুফানেও তেমন ক্ষতি হয় না। সবদিক বিবেচনায় কাঠের জাহাজের তুলনায় ইস্পাতের জাহাজ অনেক ভালো। সমস্যা দেখা গেলো এসব জাহাজ পরিত্যক্ত হলে কাঠের জাহাজের মতো পুড়িয়ে বা পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া যায় না। মেয়াদ উর্ত্তীন্ন বিশাল বিশাল জাহাজ, যার কোন কিছুই ফেলনা নয়।পরিত্যক্ত জাহাজগুলো পুনঃব্যবহারই একমাত্র উপায় হিসেবে তখন বিবেচিত হলো। উনিশ শতকের শেষের দিকে জার্মানি,নেদারল্যান্ডস, ইটালি এবং জাপানসহ আরও কিছু দেশ পরিত্যক্ত জাহাজ পুনঃব্যবহারের জন্য কেনা শুরু করে। ফলে খুব দ্রুতই জাহাজ ভাঙা পায় অর্থনৈতিক গুরুত্ব। পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্র উপকূলে একে একে গড়ে উঠতে থাকে শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড। সস্তা শ্রমিক ও অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে কখনো কখনো শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড গড়ে উঠতো।

পরিবেশগত ঝুঁকির কারণে উন্নত দেশগুলো জাহাজ ভাঙার কাজ থেকে সরে আসে। জাপান, তাইওয়ান, হংকং এর হাত ধরে পূর্ব এশিয়ায় এ শিল্পের বিকাশ ঘটে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর আন্দোলনের কারণে এ শিল্প চলে আসে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সমুদ্র উপকূলে।

বাংলাদেশে জাহাজ - ভাঙা শিল্পের উৎপত্তি দৈব- দুর্বিপাকজনিত বললে খুব একটা ভুল হবে না। ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম উপকূলে সংঘটিত এক প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডবে গ্রিক জাহাজ MD Alpine বায়ু তাড়িত হয়ে সীতাকুন্ড উপকূলের চড়ায় আটকে যায়। এটিকে আর সাগরে ভাসানো সম্ভব না হওয়ায় পরিত্যক্ত অবস্থায় কয়েক বছর সেখানেই পড়ে থাকে। ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রাম স্টিল হাউস কর্তৃপক্ষ জাহাজটি কিনে নেয় এবং সম্পূর্ণ জাহাজটি উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়াই শ্রমিকদের কায়িক শ্রমের মাধ্যমে স্থানীয় পদ্ধতিতে কয়েক বছর ধরে ভেঙে স্ক্র্যাপে পরিনত করে। মূলত এ থেকেই আমাদের জাহাজ ভাঙা শিল্পের পথ চলা শুরু। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ সময়ে একটি পাকিস্তানি জাহাজ Al AbbasAbbas মিত্র বাহিনীর বোমাবর্ষণে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশ স্বাধীনের পর দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমাদের সমুদ্র উপকূল মাইন মুক্ত করে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার উপযোগী করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষ কর্মীরাই জাহাজটি উদ্ধার করে ফৌজদারহাট উপকূলে নিয়ে আসে। কর্ণফুলী মেটাল ওয়ার্কস লিঃ নামের একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান জাহাজটি কিনে নেয় এবং স্ক্র্যাপ হিসেবে বিক্রি করে। এভাবেই শুরু হয় স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙা শিল্পের গোড়াপত্তন।

আশির দশকের শুরুতে জাহাজ ভাঙা কার্যক্রমটি শিল্পে পরিণত হয়। দেশের উদ্যোক্তরা এখাতে বিনিয়োগ শুরু করে। সময়ের পরিক্রমায় এটি এখন বড়ো ও লাভজনক শিল্পে পরিণত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে কমবেশি ৪৫ হাজারের মতো জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে। সমুদ্রগামী এসব জাহাজের গড় আয়ু ২৫-৩০ বছর। জাহাজগুলোর আয়ুষ্কালের শেষদিকে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়,ইনসুরেন্সের ও অন্যান্য খরচ এতো বেশি হয় যে তখন জাহাজ পরিচালনা ব্যয় সাশ্রয়ী হয় না।ফলে তখন জাহাজ পরিত্যক্ত ঘোষণা করে বিক্রি করে দেওয়া হয় । বিশ্বে প্রতিবছর কম বেশি ৭ শতটির মতো জাহাজ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এসব জাহাজের একটা বড়ো অংশ বাংলাদেশে রিসাইকল হয়ে থাকে। জাহাজ ভাঙা শিল্পের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রধান বন্দর নগরী চট্টগ্রামের উত্তর - পশ্চিমাংশে বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূল ঘেঁষে ভাটিয়ারী থেকে শুরু করে সীতাকুন্ডের কুমিরা পর্যন্ত প্রায় ২৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে জাহাজ ভাঙা শিল্পখাত বিস্তার লাভ করেছে। এখানে কমবেশি

১৬০ টির মতো ব্রেকিং ইয়ার্ড রয়েছে, এর মধ্যে ৪০-৫০ টি সারা বছর রিসাইকলের কাজে সক্রিয় থাকে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে অবকাঠামো নির্মাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে স্টিলের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাহাজ ভাঙা শিল্প দেশের স্টিলের কাঁচামালের উৎস হিসেবে কাজ করে। কারণ বাংলাদেশে লোহার কোন আকরিক উৎস বা খনি নেই। বাংলাদেশে কম বেশি সাড়ে তিন শত বড়ো স্টিল রিরোলিং মিল রয়েছে। এসব মিলের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে পরিত্যক্ত জাহাজের স্ক্র্যাপ ব্যবহার করা হয়। ২০১৮ ও ২০১৯ সালে বাংলাদেশ জাহাজ ভাঙা শিল্পে প্রথম অবস্থানে ছিলো। ২০২০ সালে করোনা অতিমারির সময়ও বাংলাদেশ একাই বিশ্বের ৩৮.৫ শতাংশ রিসাইকল করেছে। ২০২১ সালেও জাহাজ ভাঙা শিল্পে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম ছিলো। ২০১৮ সালে ১৯৬ টি,২০১৯ সালে ২৩৬ টি এবং ২০২১ সালে ২৫৮ টি জাহাজ ভাঙা হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বেশি জাহাজ রিসাইকল হয় বাল্ক ক্যারিয়ার। এরপর কনটেইনার শিপ ও অয়েল ট্যাংকার। গত বছর বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ২০ টি জাহাজের মধ্যে ১৪ টি রিসাইকল করা হয়েছে আমাদের দেশে,ভারত, পাকিস্থান ও তুরস্কে রিসাইকল করা হয়েছে বাকি ৬ টি শিপ। এ সব জাহাজ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৩০-৩৫ লাখ টন স্ক্র্যাপ পাওয়া যায়। দেশে বছরে প্রায় ৫৮ লাখ মেট্রিক টন রডের চাহিদা রয়েছে। শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড থেকে প্রাপ্ত স্ক্র্যাপ দেশের স্টিল মিলগুলির চাহিদা সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারে না। তাই বিদেশ থেকে কিছু স্ক্র্যাপ আমদানি করতে হয়। তবে শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলো ইস্পাতের চাহিদার কম বেশি ৭০ শতাংশ পূরণ করে থাকে। এখাত থেকে সরকার বছরে প্রায় ১ হাজার ৫ শত কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে থাকে। একটি শিপ ভাঙতে জাহাজের আকারের উপর ভিত্তি করে ৩ শ থেকে ১ হাজার লোক লাগে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ৫ লক্ষের অধিক লোক এ শিল্পের সাথে জড়িত। জাহাজ ভাঙা শিল্পে বিশ্ব বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম এরপর আছে ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক ও চীন।

জাহাজ ভাঙা শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক বিধি বাসেল কনভেনশনস ১৯৮৯, হংকং কনভেনশনস ২০০৯, আইএলও' র পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কনভেনশন ১৯৮১, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইএলও গাইডলাইনস ২০০১ এবং আইএমও গাইডলাইনস ২০১২ প্রযোজ্য। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের ১২ টি আইন ও প্রবিধান এ শিল্পের জন্য প্রযোজ্য। সবগুলো আইন ও প্রবিধান এ শিল্পের নিরাপত্তা ও  বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এ শিল্পের শ্রমিকের কাজের নিরাপত্তা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে। তবে এটা এখনো যথেষ্ট নয়।বর্তমানে এ শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জাহাজ ভাঙা হচ্ছে। আধুনিক মেশিন সম্পর্কে শ্রমিকদের ধারণা দেওয়াসহ এ সব মেশিন পরিচালনা জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দুইটি শিপিইয়ার্ড গ্রিণ শিপিইয়ার্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছে।  আরও কম বেশি ২০ টি শিপিইয়ার্ডকে গ্রিন শিপিইয়ার্ডে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ইয়ার্ডগুলোর চারপাশে পর্যাপ্ত গাছ লাগানো হয়েছে এবং হচ্ছে। শ্রমিকদের নিরাপত্তায় হেলমেটসহ অন্যান্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। সর্বোপরি এখাতের ঝুঁকি কমিয়ে নিরাপদ করার জন্য সরকার ইতোমধ্যে সকল পক্ষকে সচেতন করাসহ নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ শিল্পের উপর ভর করে আরও একটি নতুন শিল্প সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরির অবকাঠামো গড়ে উঠেছে বাংলাদেশে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু নতুন শিপ তৈরি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে সরবরাহ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরির অর্ডারও পাওয়া যাচ্ছে। দারিদ্র্যপীড়িত উন্নয়নশীল বাংলাদেশের সামষ্টিক ও ক্ষুদ্র অর্থনীতির জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের বিভিন্নখাতের অনেক  উন্নয়ন হয়েছে। কৃষি খাতের উন্নয়ন যেমন হয়েছে তেমনি শিল্প খাতেরও উন্নয়ন হয়েছে। নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা চালু হয়েছে। একদিকে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক তেমনি দেশের অর্থনীতির গতিও তরান্বিত হয়েছে। জাহাজ ভাঙা শিল্পও আমাদের সার্বিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০৩০ এ এসডিজি বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাহাজ ভাঙা শিল্পকে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সবুজ শিল্প হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। ঝুঁকিমুক্ত গ্রিন শিল্প হিসেবে উন্নত ও দারিদ্র্য শূন্য  বাংলাদেশে গড়তে শিপ রিসাইকল ইয়ার্ডগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এটাই প্রত্যাশা।

#

লেখকঃ সাবেক নৌ বাহিনীর কর্মকর্তা।